

# ডবল মামলার শামলা

হেমেন্দ্রকুমার রায়



## ডবল মামলার হামলা

আজকের প্রাতরাশটা হয়েছিল পুরোদস্তুর পূর্ণভোজনের সামিল। চায়ের পেয়ালায় অস্তিম চুমুক দিয়ে এবং একটি আরামসূচক আঃ শব্দ উচ্চারণ করে ফেললেন ডিটেকটিভ ইনস্পেকটর সুন্দরবাবু।

দৈনিক প্রভাতী খানাপিনার অব্যবহিত পরেই উল্লেখযোগ্য সংবাদ পরিবেশনের ভার ছিল মানিকের উপরে। সে সামনের টেবিলের ওপর থেকে টেনে নিল খবরের কাগজখানা।

জয়ন্ত বার করলে তার রূপোর শামুকের নস্যদানি। সে একটিপ নস্য নাসিকার সাহায্যে আকর্ষণ করতেই সুন্দরবাবু বিকৃত মুখে বলে উঠলেন, হুম! তোমার ওই নোংরা সেকেলে নেশাটা তুমি কি কস্মিনকালেও ছাড়তে পারবে না হে!

জয়ন্ত বললে, কে বলে নস্য সেকেলে নেশা? সব ব্যাপারেই উঠতি-পড়তি আছে, নস্যেরও রেওয়াজ মাঝে কিছু কমে গিয়েছিল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে নস্যের চলন আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। আপনি কি জানেন, এক ইংল্যান্ডেই বৎসরে পঁয়ষটি লক্ষ টাকার নস্য তৈরি হয়!

সুন্দরবাবু বললেন, হুম বলো কী হে! খামোখা আট কোটি পনেরো লাখ টাকা নস্য্যাৎ। বড়ই, বড়ই বড়ই অন্যায।

আজ্ঞে হ্যাঁ। নস্য নোংরা নয় মশাই, নস্য হচ্ছে রাজকীয় নেশা, তার আভিজাত্য অতুলনীয়। নস্যের উৎপত্তি আমেরিকায়, পঞ্চদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয়বার সেখানে গিয়ে কলম্বাস তার ব্যবহার দেখে এসেছিলেন। ষোলো শতাব্দীতে নস্যের আমদানি হয় ইউরোপে। তারপর সেখানকার বড় বড় রাজা-রানি, সেনাপতি, আমীর-ওমরাহ, রাজনৈতিক, কবি, শিল্পী, অভিনেতা-এমনকী সাধু-সন্ন্যাসী পর্যন্ত নস্যের সেবাইত হয়ে পড়েন। আমি তো তুচ্ছাদপি

তুচ্ছ। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের মতন ব্যক্তিও ছিলেন নস্যগতপ্রাণ। তার সোনার নস্যদানি ছিল অসংখ্য, সেগুলিরও মোট দাম হবে লক্ষাধিক টাকা। নস্যের এত কদর কেন শুনবেন?

সুন্দরবাবু গাত্রোখান করে বললেন, না ভাই, এখন আমার নস্যকাহিনি শোনবার মতো ফুরসত নেই।

কেন ত্বরা কীসের?

তদন্ত।

কীসের তদন্ত?

আত্মহত্যার। এক ভদ্রলোক পুত্রশোকে আত্মহত্যা করেছেন। বিশেষ হস্তদন্ত হতে হবে না, কারণ জোর তদন্ত নয়, একান্ত সহজ মামলা। তবু একবার যেতে হবে।

আপনার হাতে ওই খামখানা কিসের?

এর মধ্যে ঘটনাস্থলের আর লাশের খানকয় ফটো আছে।

একবার দেখি না।

ফটোগুলি নিয়ে জয়ন্ত খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে যেন নিজের মনেই বললে, মৃতদেহের ডানহাতে রয়েছে একটা রিভলভার। ওইটেই বোধহয় আত্মহত্যার অস্ত্র। ডানহাতের মনিবন্ধে দেখা যাচ্ছে একটা হাতঘড়িও।

সুন্দরবাবু বললেন, কোনও-কোনও খেয়ালি লোকের ডানহাতেই থাকে হাতঘড়ি।

তা থাকে বটে। কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে একটু বেশিরকম খেয়ালি বলেই মনে হচ্ছে!

এ কথা বলছ কেন?

মৃতদেহের সামনে রয়েছে দাবা-বোড়ের ছক। কয়েকটা খুঁটি এখনও ছকের ওপরে সাজানো আছে। তাহলে কি হত্যার আগে ভদ্রলোক দু-এক চাল দাবা খেলে নিয়ে শখ মিটিয়েছিলেন?

সুন্দরবাবু বললেন, তোমার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না। কারণ মামলাটার প্রাথমিক তদন্তে গিয়েছিলেন আমার এক সহকারী। তবে ভদ্রলোক যে রিভলবারের গুলিতে মারা পড়েছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। গুলিটা তার বক্ষ ভেদ করে পিছন দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই বুলেটটাও পাওয়া গিয়েছে।

রিভলভার আর বুলেটটা দেখবার জন্যে আগ্রহ হচ্ছে।

এখনি দেখাতে পারি, আমার গাড়ির ভিতরেই আছে।

সুন্দরবাবুর হুকুমে একজন পাহারাওয়ালা একটা ছোট ব্যাগ এনে দিয়ে গেল। তার মধ্যে ছিল ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া রিভলভার, বুলেট ও আরও কোনও কোনও জিনিস।

জয়ন্ত খুব মন দিয়ে রিভলভার ও বুলেটটা পরীক্ষা করলে। তারপর গম্ভীর স্বরে বললে, সুন্দরবাবু, মামলাটা মোটেই সহজ নয়।

সুন্দরবাবু ক্র কুণ্ঠিত করে বললেন, তার মানে? তোমার কথায় সোজা বাঁকা হবে নাকি?

রিভলভারটার মালিক ছিলেন তো মৃত ব্যক্তিই?

তাই তো শুনেছি।

তাহলে এটা হচ্ছে বড়ই জটিল মামলা। এ সম্বন্ধে আপনি আরও যা জানেন, শুনতে পেলেন খুশি হব।

অতঃপর জয়ন্তের অন্ত্রেষণের ফলে নতুন যে রহস্যনাট্যের যবনিকা উঠে গেল, তা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপেই অপ্রত্যাশিত। একটা একান্ত সাধারণ মামলা কেবল অসাধারণ হয়ে উঠল

না, তার ওপরে আরোপিত হল আর-একটা এমন নতুন ও রোমাঞ্চকর মামলা, যা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর।

সুন্দরবাবু বললেন, ভাই জয়ন্ত, মামলাটা নিয়ে এখনও আমি মাথা ঘামাবার সময় পাইনি। আজ দুদিন সর্দিজ্বরে পড়ে আমি বিছানা নিয়েছিলুম। প্রাথমিক তদন্তের পর আমার সহকারী যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, সেটুকু ছাড়া আর কিছুই জানি না। শোনো-

যিনি আত্মহত্যা করেছেন তার নাম রবীন্দ্রনারায়ণ রায়। বয়স পঞ্চাশ। তিনি দক্ষিণ বাংলার এক জমিদার। দেশ ছেড়ে উত্তর কলকাতায় বাস করতেন। বিপত্নীক। তার একমাত্র সন্তান সত্যেন্দ্র গতমাসে কলেরা রোগে মারা গিয়েছেন। প্রকাশ, তারপর থেকেই রবীন্দ্রবাবু অত্যন্ত মনমরা হয়ে থাকতেন এবং তাঁর আত্মহত্যার আসল কারণও নাকি ওই পুত্রশোক।

রবীন্দ্রবাবুর এক সহোদর দেশেই থাকতেন, কিন্তু তিনিও এখন পরলোকে এবং তাঁরও একমাত্র পুত্র দীনেন্দ্রনারায়ণই এখন রবীন্দ্রবাবুর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। যতদূর জানা যায়, রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রের বনিবনাও ছিল না, সম্পত্তি-সংক্রান্ত মতানৈক্যই নাকি এই মনোমালিন্যের কারণ।

রবীন্দ্রবাবুর বাড়ি ত্রিতল। একতলা ব্যবহার করে জমিদার সেরেস্টার কর্মচারীরা এবং পাঁচক, দারোয়ান, দাসদাসী ও অন্যান্য লোকজন। দোতলায় বৈঠকখানা এবং তাঁর মৃত পুত্রও সেখানে থাকতেন। ত্রিতলে রবীন্দ্রবাবুর শয়নগৃহ ছাড়া আর কোনও ঘর নেই।

পরশু গিয়েছে কালীপুজোর রাত্রি। শরীর সুস্থ ছিল না বলে রবীন্দ্রবাবু সেদিন সন্ধ্যার পরেই ত্রিতলে উঠে যান এবং পরদিন সকালেই ঘরের ভিতর পাওয়া যায় তার মৃতদেহ। ঘরের দরজা খোলাই ছিল-যদিও তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রবাবুর দরজা খুলে শয়ন করার অভ্যাস ছিল না।

বাড়ির লোকজনরা বলে, রবীন্দ্রবাবুর নিষেধ ছিল বলে সন্ধ্যার পর আর কোনও লোক সেদিন ত্রিতলের ঘরে যায়নি। অন্যান্য দিনেও সে ঘরে একজন ছাড়া আর কোনও বাইরের লোকের প্রবেশ করবার অধিকার ছিল না। সেই একজন হচ্ছেন সত্যানন্দ বসু, রবীন্দ্রবাবুর প্রধান ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি অন্য পাড়ার বাসিন্দা, প্রায়ই রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে আসতেন। রবীন্দ্রবাবুর দাবাখেলার শখ ছিল অত্যন্ত প্রবল, সত্যানন্দবাবুর আবির্ভাব হলেই দুজনে দাবার ছক পেতে বসে যেতেন। কিন্তু সবাই একবাক্যে বলেছে, ঘটনার দিন সত্যানন্দবাবু একবারও সেই বাড়িতে পদার্পণ করেননি।

নিজের হাতে রিভলভার ছুঁড়ে রবীন্দ্রনাথ আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু বাড়ির কেউ রিভলভারের শব্দ শুনতে পায়নি; অন্তত শুনতে পেলেও বুঝতে পারেনি, কারণ সেদিন ছিল কালীপূজো, -বোমার ও বাজির দুমদাম শব্দে সারা শহর হয়ে উঠেছিল মুখরিত।

রবীন্দ্রবাবুর ভাইপো দীনেন্দ্র খবর পেয়ে কলকাতায় এসে হাজির হয়েছেন। সত্যানন্দবাবুকেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। আজ তদন্তে গিয়ে প্রথমেই তাঁদের এজাহার গ্রহণ করব।

জয়ন্ত বললে, আমিও যদি সঙ্গে যাই, তাহলে আপনার কোন আপত্তি আছে?

মোটাই না, মোটেই না। মানিকও যেতে পারে। কিন্তু জয়ন্ত হঠাৎ তোমার এই আগ্রহের কারণ কী? কোনও সূত্র-টুত্র পেয়েছ নাকি?

যথাসময়েই জানতে পারবেন।

ওই রোগেই তো ঘোড়া মরেছে? এত ঢাকঢাক-গুড়গুড় কেন বাবা?

জয়ন্ত জবাব দিল না।

রবীন্দ্রনারায়ণের বাড়ি। সদর দরজায় পুলিশ পাহারা।

দোতলার বৈঠকখানায় উপবিষ্ট দুই ভদ্রলোক। একজন প্রৌঢ়, মাথায় কাঁচা-পাকা লম্বা চুল, শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, চোখে কালো চশমা, দোহারা চেহারা, পরণে পাঞ্জাবি ও পায়জামা। একান্ত বিষণ্ণ ভাবভঙ্গি।

আর একজন যুবক, বয়স বাইশের বেশি নয়, সুশ্রী, ফরসা, একহারা দেহ, জামাকাপড়ে বাবুয়ানার লক্ষণ। মুখ-চোখ ভাবহীন।

যুবকের দিকে তাকিয়ে সুন্দরবাবু শুধোলেন, আপনিই বোধহয় দীনেন্দ্রবাবু।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আর উনি?

সত্যানন্দবাবু-আমার জ্যাঠামশাইয়ের বিশেষ বন্ধু।

উত্তম। বাড়ির আর সবাইকে ডাকুন। আমি সকলের এজাহার নেব।

সকলেরই আবির্ভাব। একে একে প্রত্যেকেই এজাহার দিল। বিশেষ কোনও নতুন তথ্য প্রকাশ পেল না।

এইবারে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা দীনেন্দ্রবাবু, আপনার জ্যাঠা কি ন্যাটা ছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর বাঁ-হাতই বেশি চলত।

তাই তিনি ডানহাতেই কবজি ঘড়ি ব্যবহার করতেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আপনাদের মনোমালিন্যের কারণ কি?



কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে দীনেন্দ্র বললে, মনোমালিন্যের উৎপত্তি হয় তিনটি মুক্তোর জন্যে।

তিনটি মুক্তো?

হ্যাঁ, তিনটি মহামূল্যবান মুক্তো।

ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না।

বুঝিয়ে বলছি। আমার প্রপিতামহ সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জন্যেই আমাদের বংশের সমৃদ্ধি আরম্ভ হয়। সিপাহী বিপ্লবের সময়ে তিনি ইংরেজ ফৌজে রসদ বিভাগের পদস্থ কর্মচারী হয়ে পশ্চিম ভারতে গিয়েছিলেন। সেই দেশব্যাপী অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার যুগে কী উপায়ে জানি না, তিনি প্রচুর ধনদৌলতের মালিক হয়ে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে ছিল। তিনটি অপূর্ব ও অমূল্য মুক্তো-শুনেছি তিনি তা পেয়েছিলেন কোনও ভাগ্যহীন নবাবের কাছ থেকে। মুক্তো তিনটি আমিও দেখেছি। দুটির আকার পায়রার ডিমের মতো, একটি আরও বড়। তেমন বড় মুক্তো আমি আগে কখনও দেখিনি, আজকের বাজারে তাদের দাম অন্তত দুই-আড়াই লক্ষ টাকাও হতে পারে। এই মুক্তো তিনটি আমার পিতামহের অধিকারে আসে উত্তরাধিকার সূত্রে। তারপর আমার জ্যাঠামশাই ও আমার পিতা দুজনেরই দাবি ছিল তাদের উপরে। কিন্তু জ্যাঠামশাই আমার বাবার দাবি অগ্রাহ্য করে বলেন, তাঁর বাবা ওই মুক্তো তিনটি কেবল তাঁকেই দিয়ে গিয়েছেন। এই নিয়েই প্রথমে মনোমালিন্য, তারপর মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

জয়ন্ত ভাবতে-ভাবতে বললে, বটে, এমন ব্যাপার। সেই মুক্তো তিনটি এখন কোথায় আছে?

শুনেছি জ্যাঠামশাইয়ের শোবার ঘরে লোহার সিন্দুকে। কিন্তু সে ঘর তো এখন পুলিশের জিম্মায়।

সুন্দরবাবু করলেন একটি নিষ্ঠুর প্রশ্ন, তাহলে রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর ফলে আপনিই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন?



দীনেন্দ্র বিরক্ত মুখে বললে, লাভ-লোকসানের হিসাব এখনও আমি খতিয়ে দেখিনি মশাই!

কিন্তু পুলিশ তা দেখতে বাধ্য।

দেখুন।

জয়ন্ত এইবারে সত্যানন্দের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, আপনার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর জন্যে আপনি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন।

সত্যানন্দ করুণস্বরে বললেন, কাতর হব না? তিনি আর আমি ছিলুম হরিহর আত্মার মতো, বহু সুখ-দুঃখের দিন আমাদের একসঙ্গে কেটে গিয়েছে।

তা হলে আপনারা ছিলেন পুরাতন বন্ধু?

না, ঠিক তা বলতে পারি না। তার সঙ্গে আমার আলাপ হয় বছর চারেক আগেই। কিন্তু এর মধ্যেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়ে উঠেছিল পুরাতন বন্ধুদের মতোই।

রবীন্দ্রবাবু আপনার সঙ্গে দাবা খেলতে ভালোবাসতেন?

হ্যাঁ, আমি এলেই তিনি পাততেন দাবার ছক।

রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর দিনেও তাঁর সঙ্গে আপনি দাবা খেলেছিলেন?

আজ্ঞে না, সেদিন আমি নিজের বাড়ির বাইরে পা বাড়াতেই পারিনি।

কেন?

অসুস্থতার জন্যে। উদরাময়।

কিন্তু সেদিনও সন্ধ্যার সময়ে বা পরে রবীন্দ্রবাবু দাবা খেলেছিলেন।

অত্যন্ত বিস্মিতের মতো সত্যানন্দ নিজের দীর্ঘ দাড়ির ভিতরে অঙ্গুলি চালনা করতে করতে বললে, কেমন করে জানলেন?

তার মৃতদেহের সামনে পাতা ছিল দাবার ছক আর সেই ছকের ওপরে সাজানো ছিল গোটাকয়েক ঘুঁটি।

ও, তাই বলুন। তা হতে পারে! যারা দাবা খেলতে অভ্যস্ত, তারা মাঝে-মাঝে নতুন চালের কৌশল আবিষ্কার করবার জন্যে একা একাই ছকের খুঁটি সাজিয়ে বসে।

ঠিক। সেটা আমিও জানি। আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা নেই।

সুন্দরবাবু সদলবলে প্রথমে বাড়ির একতলার সর্বত্র ঘুরে-ঘুরে দেখলেন।

তারপর দ্বিতল। চারখানা বাস করবার ঘর, তারপর পাখানা ও গোসলখানা। বাইরের দিকে একফালি বারান্দা থেকে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি নিচের একটা শুড়িগুলির ভিতরে নেমে গিয়েছে।

জয়ন্ত শুধাল, এই সিঁড়িটা বোধহয় মেথরের ব্যবহারের জন্যে?

দীনেন্দ্র বললে, হ্যাঁ।

নিচের শুড়িগুলিটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?

বাড়ির বাইরেকার রাস্তায়।

কোনও লোক যদি সদর দরজার বদলে ওই শুড়িগুলি দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠে, তাহলে বাড়ির লোক তাকে দেখতে পাবে না-তাই নয় কি?

হ্যাঁ।

তারপর ত্রিতলে রবীন্দ্রবাবুর শয়নকক্ষ। তালাবন্ধ দরজার চাবি ছিল পুলিশের কাছে। দরজা খুলে সকলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

মাঝারি আকারের ঘর। একদিকে খাট, একদিকে ড্রেসিংটেবিল, একদিকে একটা প্রকাণ্ড আলমারি এবং একদিকে একটা ভারী সেকেলে ডালা-দেওয়া লোহার সিন্দুক। খানদুই চেয়ার। কার্পেটমোড়া মেঝেয় ছোট বিছানা পাতা। গুটি দুই তাকিয়া।

মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু মেঝের বিছানার একাংশে ও একটা তাকিয়ার ওপরে রয়েছে শুকনো রক্তের ছোপ। বিছানার মাঝখানে দাবার ছক, তার ওপরে ও আশেপাশে কতকগুলি খুঁটি।

সুন্দরবাবু বললেন, দীনেন্দ্রবাবু এইবারে আপনি সিন্দুক খুলে মুক্তা-টুক্তা কী আছে বার করুন। আমরা এখনও সিন্দুক পরীক্ষা করিনি। এই নিন রবীন্দ্রবাবুর চাবির গোছা, এটা লাশের পাশেই পাওয়া গিয়েছে।

জয়ন্ত বললে, সাবধানে দীনেন্দ্রবাবু, আপনি সিন্দুকের হাতলে হাত দেবেন না, চাবিটা আমাকে দিন, আমি সিন্দুক খুলছি।

সুন্দরবাবু কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জয়ন্তের চোখের ইশারা দেখেই তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

সিন্দুকের মধ্যে তথাকথিত একটিমাত্র মুক্তাও আবিষ্কৃত হল না। পরিবর্তে পাওয়া গেল একতাড়া দলিল-দস্তাবেজ, অন্যান্য কাগজপত্র, একশো টাকার বারোখানা নোট, কতকগুলো পুরাতন মোহর ও কিছু খুচরো টাকা প্রভৃতি।

দীনেন্দ্র বললে, কী আশ্চর্য মুক্তাগুলো কে নিলে?

সত্যানন্দ বললেন, কে আবার নেবে বাবা? তোমার জ্যাঠা ছেলের শোকে আত্মঘাতী হয়েছেন, বাইরের কেউ এখানে আসেনি। চোর এলে কি অতগুলো টাকা আর মোহর সিন্দুকের ভেতরেই ফেলে রেখে যেত?

সুন্দরবাবু বললেন, ঠিক কথা। পায়রার ডিমের মতো ডাগর-ডাগর মুক্তো যদি রূপকথার অশ্বাভিষেক না হয়, তাহলে সেগুলো অন্য কোথাও লুকোনো আছে, খুঁজে দেখতে হবে।

সুন্দরবাবুর গা টিপে দিয়ে জয়ন্ত বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পিছু পিছু গিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, আবার গা টেপাটেপি কেন? তোমার আবার কী গুপ্তকথা?

সিন্দুকের হাতলে কারুর আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় কি না পরীক্ষা করে দেখুন।

মানে?

পরে বুঝবেন।

.

দিন দুই পরে দূরভাষের মধ্যস্থতায় শ্রুতিগোচর হল থানায় বিরাজমান সুন্দরবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর : হ্যালো! জয়ন্ত শোনো। তুমি যা বলেছ তাই!

আমি কী বলেছি?

রবীন্দ্রনারায়ণ রায় আত্মহত্যা করেনি।

নবীন সহকারীর ওপর নির্ভর না করে একটু মাথা ঘামালে আপনিও এটা বুঝতে পারতেন।

আমি কিন্তু তোমার চেয়েও বড় একটা আবিষ্কার করেছি।

আপনাকে অভিনন্দন দিচ্ছি।

তারপর থেকে আমার অবস্থা হয়েছে কীরকম জানো? যাকে বলে একেবারে সসেমিরা!

ভাবনার কথা!

সব শুনলে তোমারও আক্কেলগুডুম হয়ে যাবে।

ভয়ের কথা!

ফোন ছেড়ে সবেরে থানায় ছুটে এসো।

যথা আজ্ঞা।

থানায় গিয়ে জয়ন্ত দেখলে, সুন্দরবাবু তখনও উত্তেজিতভাবে ঘরের ভিতর পদচালনা করছেন।

ভো সুন্দরবাবু, অতিথি হাজির। আপনার সন্দেহ পরিবেশন করুন।

তিষ্ঠ ক্ষণকাল। রবীন্দ্রবাবু যে আত্মহত্যা করেননি, সেটা তুমি কেমন করে ধরতে পারলে আগে সেই কথাই বলো।

দেখলুম মৃতের ডান হাতে রয়েছে হাতঘড়ি। কোনও-কোনও খেয়ালি ব্যক্তি ডানহাতেও ঘড়ি ধারণ করে বটে, কিন্তু সেটা হচ্ছে ব্যতিক্রম। সাধারণত যারা ন্যাটা, অর্থাৎ ডানহাতের কাজ সারে বাম হাতে, তারাই হাতঘড়ি ব্যবহার করে ডানহাতে। অতএব ধরে নিলুম রবীন্দ্রবাবু ন্যাটা। সে ক্ষেত্রে বাম হাতে রিভলভার নিয়েই তাঁর আত্মহত্যা করবার কথা। কিন্তু রিভলভার ছিল তার ডান হাতে। তাই দেখেই প্রথমে আমার সন্দেহ জাগ্রত হয়। কিন্তু তা হচ্ছে সামান্য সন্দেহ, বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

বেশ তারপর?

তারপর দেখলুম মৃতের সামনে দাবার ছক। যে আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুত, তার মনের অবস্থা হয় ভয়ানক অস্বাভাবিক, তার দাবা খেলবার বা নতুন চাল আবিষ্কার করবার শখ কিছুতেই হতে পারে না। রবীন্দ্রবাবু নিশ্চয় সেদিন সহজ আর স্বাভাবিক মন নিয়েই আর কারুর সঙ্গে দাবা খেলায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, আত্মহত্যার কোনও ইচ্ছাই তার ছিল না।  
সুতরাং

সুতরাং তোমার সন্দেহ দৃঢ়তর হল, কেমন এই তো!

হ্যাঁ। তারপর রিভলভার আর বুলেট দেখেই নিঃসন্দেহে আমি বুঝতে পারলুম যে, এটা হচ্ছে আত্মহত্যার নয়, নরহত্যার মামলা। রবীন্দ্রবাবুর হাতের রিভলভারটা ছিল ২২ ক্যালিবারের ছোট রিভলভার, তার ভিতর থেকে ৩৮-ক্যালিবারের বুলেট নির্গত হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ যে বুলেটটা হয়েছে রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর কারণ, সেটা বেরিয়েছে কোনও ৩৮-ক্যালিবারের রিভলভার থেকে।

সুন্দরবাবু বললেন, তাহলে হত্যার কারণ চুরি?

সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তবে সিন্দুকের ভিতর থেকে টাকা আর মোহরগুলো চুরি যায়নি কেন?

এই খুনে-চোর হচ্ছে অতিশয় চতুর। সে পুলিশকে ভুল পথে চালাতে চায়। সে লাভ করতে চায় তিন-তিনটি মহামূল্যবান অতুলনীয় মুক্তা, তার কাছে কয়েক শত টাকা তুচ্ছ। সে দেখাতে চায় চুরি বা হত্যা করবার জন্যে কেউ ঘটনাস্থলে আসেনি। তাই রবীন্দ্রবাবুর হাতে তার নিজের রিভলভার গুঁজে দিয়ে আর টাকাগুলো ফেলে রেখে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি ভেবে দেখতে পারেনি যে, ন্যাটা রবীন্দ্রবাবুর ডান হাতে রিভলভার থাকতে পারে না-বিশেষত ২২ ক্যালিবারের রিভলভার। তার আরও একটা মস্ত ভ্রম হয়েছে। দাবার ছক আর খুঁটি সে তুলে। রেখে যায়নি। অধিকাংশ হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই এমনি সব ছোটখাটো ত্রুটি থেকে যায় বলেই হত্যাকারী শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারে না।



জয়ন্ত, অনেক কথাই তো তুমি ভেবে দেখেছ। কিন্তু তুমি কি বলতে পারো, হত্যাকারী কে?

বাড়ির লোকদের কথা মানলে বলতে হয়, বাহির থেকে কোনও ব্যক্তিই সেদিন বাড়ির ভিতরে আসেনি। অথচ সেদিন রবীন্দ্রবাবুর পরিচিত কোনও লোক তার সঙ্গে দাবা খেলেছে, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এখন আমাদের খুঁজে দেখতে হবে, সেই খেলোয়াড় ব্যক্তি কে?

আমি জানি সে কে!

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, আপনি জানেন!

নিশ্চয়। তোমার আগে আমিই তাকে আবিষ্কার করেছি।

বাহাদুর! কিন্তু কে সে?

বাড়ির কেউ নয়।

দীনেন্দ্র?

না।

সত্যানন্দ!

সেও নয়।

তবে?

তার নাম নফরচন্দ্র প্রামাণিক।

সুন্ধভাবে স্থির হয়ে বসে রইল জয়ন্ত নির্বাতনিকম্প দীপশিখার মতো। কিন্তু মস্তিষ্ক চালনা করতে লাগল তুরন্ত গতিতে, তারপর সে ধীরে-ধীরে বললে, বুঝেছি। আপনার এই আবিষ্কারের মূলে আছে আমারই অভিভাবন!

অভিভাবন! সে আবার কী চীজ!

সাজেসান-এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে অভিভাবন।

মাথায় থাক আপনার বাংলা পরিভাষা, এর চেয়ে ইংরেজিই ভালো। কিন্তু আমার আবিষ্কারের সঙ্গে তোমার সাজেসান-এর সম্পর্ক?

আমি কি আপনার কাছে প্রস্তাব করিনি যে রবীন্দ্রবাবুর লোহার সিন্দুকের হাতলটা আঙুলের ছাপের জন্যে পরীক্ষা করা হোক?

তা করেছিলে।

তা করা হয়েছে কি?

হুঁ।

আর তারই ফলে বোধকরি তথাকথিত নফরচন্দ্র প্রামাণিক নামধেয় ব্যক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে?

সুন্দরবাবু ফিক করে হেসে ফেলে বললেন, ভায়া হে, তোমার ওপরে টেক্কা মারা অসম্ভব দেখছি! হ্যাঁ, ঠিক তাই! সিন্দুকের হাতলে ছিল আঙুলের ছাপ। পুলিশের ফাইলে সেই আঙুলের ছাপের জোড়া পাওয়া গেছে। সে ছাপ হচ্ছে নফরচন্দ্র প্রামাণিকের।

ওই মহাপুরুষের পরিচয় কী?

অতিশয় চিত্তোত্তেজক। পুলিশের কাছে রক্ষিত অপরাধীদের ইতিহাসে দেখি, সাত বৎসর আগে নফরচন্দ্র একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু উপযোগী প্রমাণ অভাবে খালাস পায়। তার পর-বৎসরেই দু-দুটো খুন আর অর্থলুণ্ঠন করে সে আবার অভিযুক্ত হয় রাহাজানির মামলায়। বিচারে তার প্রতি পনেরো বৎসর কারাবাসের হুকুম হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর আগে সে জেল ভেঙে পালিয়ে যায়। সেই থেকেই নফরচন্দ্র ফেরার। যে তাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

আপনি তাকে দেখেছেন?

না, তার কোনও মামলাই আমার হাতে আসেনি।

নফরচন্দ্র যখন দাগী আসামি, পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই তার ফটো আছে?

আছে বইকী! এই নাও।

শ্মশ্রুগুম্ফহীন এক সাধারণ চেহারার লোক সুশ্রী বা কুশ্রী কিছুই বলা যায় না। কেবল জোড়া ভুরুর তলায় দুই চক্ষু দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে যেন দ্রুরতার আভাস। বয়স হবে চল্লিশ বিয়াল্লিশ।

সুন্দরবাবু অভিযোগপূর্ণ স্বরে বললেন, আত্মহত্যার মামলা হয়ে দাঁড়াল নরহত্যার মামলা-তার সঙ্গে এল আবার তিন-তিনটে হত্যাকাণ্ডের নায়ক ফেরারি নফরচন্দ্রের মামলা! বাপ রে, এখন এই ডবল মামলার হামলা একলা সামলাই কেমন করে? নফরের মতো ধড়িবাজের পাত্তা পাওয়া কি সোজা কথা? পুলিশের কেউ যা পারেনি, আমি তা পারব কেন?

তীক্ষ্ণনেত্রে নফরচন্দ্রের ফটোর দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু আপনার বকবকানি থামান। এখানে স্বচ্ছ কাগজ আছে?

স্বচ্ছ কাগজ?

হ্যাঁ, ইংরেজিতে যাকে বলে ট্রেসিং পেপার।

মরছি নিজের জ্বালায়, এখন তোমার ওইসব ছাঁকা বাংলা বুলি ভালো লাগছে না। কেন সোজাসুজি বলতে পারো না কি-ট্রেসিং পেপার চাই? তা থাকবে না কেন? কিন্তু ও জিনিস নিয়ে তোমার আবার কী হবে?

একটু অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন।

জয়ন্তের অল্পস্বল্প ছবি আঁকার হাত ছিল। সুন্দরবাবুর দিকে পিছন ফিরে বসে ফাউন্টেন পেন ও ট্রেসিং পেপারের সাহায্যে সে ফটো থেকে নফরচন্দ্রের একখানা ছবছ প্রতিলিপি তুলে নিলে। তারপর সেই নকল করা মুখের ওপরে যথাস্থানে ঐকে ফেললে লম্বা চুল, কালো চশমা, ঘন গোঁফদাড়ি।

সুন্দরবাবু বিরক্তভাবে বললেন, আরে গেল, ও আবার কী ছেলেমানুষি হচ্ছে শুনি?

সুন্দরবাবু এখন দেখুন দেখি, এই লোকটিকে কি চেনেন বলে মনে হচ্ছে? জয়ন্ত প্রশ্ন করলে কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে।

সুন্দরবাবু প্রথমে নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই ছবিখানার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর দেখতে দেখতে যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার দুই চক্ষু। তিনি চমৎকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আরে আরে, এ যে রবীন্দ্রবাবুর বন্ধু সত্যানন্দ বসুর মুখ।

.

জয়ন্ত রূপোর শামুকানি থেকে একটিপ নস্য নিয়ে হাস্যমুখে বললে, ছবিতে আঁকা মুখে লম্বা চুল, কালো চশমা আর গোঁফদাড়ি বসিয়ে দিতেই নফরচন্দ্রের মূর্তির ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করছে সত্যানন্দ স্বয়ং! এমন যে হবে, আমি তা আগেই অনুমান করেছিলুম। আমি নফরকে চিনতুম না, তার জীবনীও জানতুম না, কিন্তু এই মামলায় সমস্ত দেখে-

শুনে আমি সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করেছিলুম সত্যানন্দকেই। চেহারার রকমফের করে নাম ভাড়িয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নফরচন্দ্র বহাল তবিয়ে হতভাগ্য রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে মিতালি জমিয়ে ফেলেছিল-প্রথম থেকেই তার কুদৃষ্টি ছিল সেই মুক্তা তিনটির উপরে। সকলের অগোচরে শুড়িপথ দিয়ে ঢুকে মেথরের সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সে পাপকার্য সেরে আবার অদৃশ্য হয়েছিল। কিন্তু এইবারে তাকে মুখোশ খুলতে হবেই। নফরচন্দ্র এখনও আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে কারণ এখনও সে সন্দেহ করতে পারেনি যে, আমরা তাকে সন্দেহ করেছি। সুতরাং উঠুন। জাগুন। ছুটুন সবাই নফরচন্দ্র ওরফে সত্যানন্দের আস্তানার দিকে।

হুম! তথাস্তু, তথাস্তু, তথাস্তু!

.

নফর ওরফে সত্যানন্দের বাড়ি।

চারিদিকে পুলিশ পাহারা বসিয়ে সদরে কড়া নাড়তে-নাড়তে সুন্দরবাবু ডাকলেন, সত্যানন্দবাবু, সত্যানন্দবাবু!

বারান্দা থেকে উঁকি মারলে সত্যানন্দের মুখ। পুলিশ দেখে তার ভাবান্তর হল না। সহজ সুরেই শুধোলে, অধীনের গোলামখানায় আপনারা যে?

মামলা সংক্রান্ত একটা জরুরি কথা জানতে এসেছি।

বেশ করেছেন! বেয়ারা গিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছে। সোজা ওপরে চলে আসুন।

দোতলায় ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে সুন্দরবাবু, তারপর জয়ন্ত, তারপর আরও দুজন পুলিশ কর্মচারী।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সত্যানন্দ হাসিমুখে বললে, অনুগ্রহ করে সকলে আসন গ্রহণ করুন। সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, বসবার সময় নেই।

কিন্তু আপনারা কী জরুরি কথা জানতে চান? যা বলবার সব তো আমি বলেছি।

কিন্তু একটা কথা বলেননি।

কী?

আপনি নফরচন্দ্র নামটা ত্যাগ করলেন কেন?

পরমুহূর্তে সুন্দরবাবুর বক্ষের ওপরে নিষ্কিণ্ত হল যেন দুর্যোধনের মহাগদা! আচম্বিতে নফরচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষিপ্ৰগতিতে সুন্দরবাবুর বুকের মাঝখানে করলে পদাঘাত এবং বপুস্মান সুন্দরবাবুর দেহ ঠিকরে গিয়ে পড়ল হুড়মুড় করে একেবারে জয়ন্তের ওপরে এবং সঙ্গে-সঙ্গে ঘর কাঁপয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন ও গুরুভার দেহপতনের শব্দ।

মেঝের ওপরে অল্প ছটফট করেই নফরচন্দ্র ওরফে সত্যানন্দের মূর্তি নিশ্চেষ্ট ও একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। তার কপাল থেকে বেরুতে লাগল ঝলকে ঝলকে রক্ত।

সুন্দরবাবু আপশোশ করে বলে উঠলেন, হায় হায় হায়! নফরা আমাকে লাথি মেরেও ফাঁকি দিলে, ব্যাটাকে ফাঁসিকাঠে দোল খাওয়াতে পারলুম না! ছি জয়ন্ত, ওকে তোমার বাধা দেওয়া উচিত ছিল?

জয়ন্ত হেসে বললে, উচিত তো ছিল, কিন্তু আপনি এমন কমলির মতন আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন যে আমার অবস্থা তখন ন যযৌ ন তহৌ। তবে আপনার একূল ও কূল দুকূল নষ্ট হয়নি, নফরচন্দ্রের লাশ দাখিল করতে পারলেও আপনার ভাগ্যে লাভ হবে পুরস্কারের পঞ্চসহস্র মুদ্রা।

## হুমেন্দ্রবুন্নার রাগ । ডবল মামলার হামলা

পুরস্কারের কথা মনে হতেই সুন্দরবাবু একমুখ হাস্য করলেন। তারপর বুকের ওপরে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, নফরা তো পটল তুলল, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর মুক্তো তিনটে কোথায় লুকিয়ে রেখে গেল।

জয়ন্ত বললে, আশা করি এখানে খানাতল্লাশ করলেই মুক্তো পাওয়া যাবে। আর নফরের হাতের ওই রিভলভারটা দেখুন। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রবাবু মারা পড়েছেন ওই রিভলভারের বুলেটেই।